অযান্ত্রিক

বর্ষ ১৬ | সংখ্যা ৩ | জানুয়ারি ২০২৬
www.risidalai.com

ফয়েজ আলমের কবিতা

অযান্ত্রিক
বর্ষ ১৬ | সংখ্যা ৩ | জানুয়ারি ২০২৬
www.risidalai.com

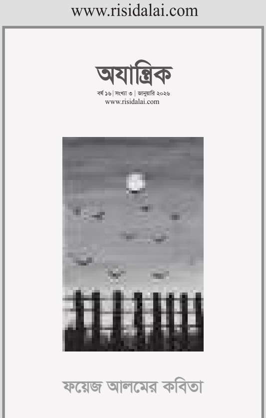

শুভ বাংলাদেশের প্রত্যাশায়

র‍্যাব কর্তৃক কর্তৃত্ব বহির্ভূত ক্রসফায়ার বন্ধের পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে ‘স্টপ ক্রসফায়ার’ শিরোনামে ২০১১ সালে ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২য় সংখ্যার বিষয় ছিলো ‘স্টপ টিপাইমুখ ড্যাম’। তারপর দীর্ঘ বিরতি। দীর্ঘ বিরতির পর প্রকাশিত হলো ‘অযান্ত্রিক’। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিগত সরকারের পতনে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর জনমনে আশার সঞ্চার হয়েছিলো। অনিয়ম, অন্যায়, জুলুম তথা বৈষম্য নিরসন- সর্বোপরি রাষ্ট্রের সংস্কার ছিলো মানুষের অন্যতম চাওয়া। দুঃখজনক হলেও সত্যি কোনোটাই হয়নি। বিপক্ষ মত দলনের নামে মবসন্ত্রাস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অনেকসময়ই এসব অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। এদেশ সুফি-বাউলদের। ধর্মীয় উগ্রতা বরাবরই এখানে নিন্দিত। বরং সর্বধর্মের নিরাপদ আশ্রয় ক্রোড়ে এদেশের মানুষেরা বেড়ে উঠেছে। সমন্বয়বাদী দর্শন অধ্যাত্মচেতনা এখানে প্রবল। স্পষ্ট বিভাজনরেখা তৈরির সূক্ষ্ম চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্ফিনিক পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশ জেগে উঠবে এই প্রত্যাশা আমাদের।

এ সংখ্যার বিষয়- ‘ফয়েজ আলমের কবিতা’। কবি ফয়েজ আলম তত্ত্বচর্চার পাশাপাশি কবিতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। নিজস্ব ভাষা নির্মাণের পাশাপাশি বাংলার সুফি-ঘরানাকে তার নিজস্ব বয়ানে পাঠকের সামনে হাজির করছেন কবিতার মাধ্যমে।

www.risidalai.com
www.charbak.com

সম্পাদক

রিসি দলাই

প্রচ্ছদ

ইসফাক রায়হান

প্রকাশক

রুবিনা সুলতানা

কম্পোজ

সংবর্ত

৬৪/সি/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, টিকাটুলি, ঢাকা

মুদ্রণ

সারকো মিডিয়া এইড সার্ভিসেস

১১৯ সরদার গলি, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

৬৪/সি/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, টিকাটুলি, ঢাকা

editor_charbak@yahoo.com
editor.charbak@gmail.com

মুঠোফোন +৮৮ ০১৫৫২-৪১৯৪৪২, ০১৯৭৩৯৭১৪৪২

মূল্য

দুই শত টাকা (বাংলাদেশ)
তিন শত টাকা (ভারত), দশ ডলার (অন্যান্য)

নিয়মিত আড্ডার

২৭ বছর

সাহিত্য আলোচনা ও আড্ডা

আপনি আমন্ত্রিত

শুক্রবারের আড্ডা

www.risidalai.com
www.charbak.com
৬৪/সি/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, টিকাটুলি, ঢাকা

বিজয়ের মাসে
আমাদের
যাত্রা
হলো
শুরু

২০১৫

scdl

শিলালিপি কনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড

ই-মেইল : shilalipi.con2015@gmail.com

কবি ফয়েজ আলমঃ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন
সাফির সাফিন

প্লেটো তার 'রিপাবলিক' নামক সহি কিতাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলাপে সুর তুলেছিলেন দর্শন এবং কাব্যের বিরোধ নাম দিয়া, আলাপ পুরোনো তবে মেজাজ পুরোনো হয় নাই। নানা আসরে বিষয়টা নিয়া তর্ক আকছার কিন্তু সমাধান নাই। একাধারে বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপে অন্যদিকে কাব্যসাধনায় সফল সচরাচর দেখা যায় না। আজকের আলাপ যাকে নিয়া তিনি একাধারে উত্তরউপনিবেশি ভাবচর্চার পথিকৃৎ অন্যদিকে কবি। তিনি উপনিবেশি শাসন-শোষণ আর তার পরিণাম, ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের শোষণ-নিপীড়ন ও ক্ষমতার নানামুখি নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সরব। আধ্যাত্মিকতার সাথে সাহিত্যিক-রাজনৈতিক তত্ত্বচর্চা কবিতার দেহে ধারণ করে কবিতায় অনায়াসে নিমগ্ন হন তিনি। মানুষের প্রাত্যহিক মুখের ভাষাকে তিনি নিয়েছেন তার চর্চার প্রকাশমাধ্যম হিসেবে। ব্যক্তির মৃত্যু ও খাপ-খাওয়া মানুষ (১৯৯৯); জলছাপে লেখা (২০২১), রাইতের আগে একটা গান (২০২২); আমারে উড়াও ধুলা (২০২৪), যখন রুহুরে হারায়ে ফেলি (২০২৫) তার আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রকাশ, একই সাথে ভাষা নির্মাণেও প্রয়াস।

কবিতাতো লেখা হচ্ছে আকছার তাতে তার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? তিনি দর্শনচর্চা করেন, উত্তরউপনিবেশিক তাত্ত্বিক, তাতে কাব্যের বিরোধ নাই, বরং বৈশ্বিকতার সাথে দেশজ আকাঙ্ক্ষা যেখান থেকে তিনি বেড়ে উঠেছেন, যেটা তার একান্তই নিজস্ব উঠোন তা আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিকতার সাথে আধ্যাত্মিকতার মিশেলে মানুষের মনোজগতের যে বিপুল বিশাল অনালোকিত অপ্রবেশগম্য বিশ্ব তিনি সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে পেরেছেন। দেশের অনাথ অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেমন তাকে আলোড়িত করে তেমনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তার ভাবনায় সমান প্রাধান্য পায়, ফলে তার কবিতার প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র দেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকে না, হয়ে যায় অনেকটাই আন্তর্জাতিক, বৈশ্বিক।

মানুষ সতত অনুসন্ধানী সে তার ভেতর অন্য মানুষকে দেখতে চায়, অনুভব করতে চায়, আপনাকে জারি রাখতে চায়। অস্পষ্ট ঝাপসা আয়নায় কখনো কখনো স্পষ্ট হয়, ভাবনারাশি প্রকাশ পায়, কবি ফয়েজ আলম সেই মানুষ যে তার ভেতরের মানুষটাকে অনুসন্ধান করতে চান। ফলে তার কবিতা আলো-আঁধারির বিভ্রম তৈরি করে বৈকি। নিমগ্ন মানুষ যখন গূঢ় নিমগ্নতায় তলিয়ে যান কবিতা তখন আলো-আঁধারির রহস্যে পতিত হয়, যা সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে, পাঠক অনেকসময় গূঢ়রহস্য ধরতে পারেন না, আলোচ্য কবি তার বাইরে নন। আর শতবছরের বাউল-সুফি সাধনার ক্রমবিবর্তন তা যেহেতু কবির কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পাথেয় তাই স্বাভাবিকভাবেই তার কবিতায় গূঢ়তত্ত্ব জীবনের প্রাত্যহিকতায় লীন হয়ে অন্য মাত্রা পায়। সংকট থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করে।

আসুন তার কবিতাবিশ্বে খানিকটা ভ্রমণের চেষ্টা করিঃ

যেন বা একটাই বাজার তাতে দুই কিসিমের কানা মানুষ-
আন্ধা তাহারা আমার অ-দেখার ভিতর এই জগতেরে দেখে, চলেফিরে।
আমি স্বেচ্ছা আন্ধা তারারে হাতড়ায়্যাই ফিরতাছি।
(কানার বাজার)

চোখের মেমোরিতে জমা হইছিল কিছু, কয়েক বছর,
আমাদের সেই মায়াবী সময়ের অপরূপ-
মাইঝরাতে আমাদের চোখ তাকায়া তাকায়া তাই দেখে।
আমরা আর ঘুমাতে পারি না।
(চোখের দুঃখুগুলি : দুই)

বাজানো শেষ হইলে আমি আফসোসের কাছে বসি,
জীবনে কীবোর্ড বাজানো শিখলাম না কেন, আহা!
ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে আঙ্গুল নাড়ায়া-চাড়ায়া ভাব ধরি
যদি ভুলে আমারে বাজনদার ভাইবা
তার আত্মা আইসা জায়গা লয় ফের
আমার আঙ্গুলের নিচে
তাইলে আমিও তার সাথে সেইসব গোপন কান্না
কিছু কানতে পারতাম
মাঝে মাঝে উড়তে পারতাম গাছে ডালে এতিমের উড়াউড়ি।
(আমার মেয়েরা যখন কীবোর্ড বাজায়)

তবু আশায় আশায়
কায়া ফেইলা ছায়ারে ধরতেছি মনে মনে
পার হইতে চাইতেছি চামড়া গোশতের দেয়াল।
(ধুলার সিংহাসন)

আমার মায়ের সোনাভরা জাহাজ পাচার
কখনো থামে না।
(উপনিবেশের কায়াবদল)

'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো...'
অথচ আষাইঢ়্যা চান রাইতের নিশা কিবা
বাঁসমতি ধানের কথাডা আমার কওয়াই হইল না।
(একুশ শতকের দুই বাঙালির আলাপসালাপ)

ফয়েজ আলম শুধু কবিতা রচনা করতে চান না, চান সময়কে ধারণ করে তত্ত্বের সাথে তথ্যের, দর্শনের সাথে আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন ঘটাতে। তাই তার কবিতা শুধু কবিতা থাকে না, ধারণ করে সময়কে, পূর্ণাঙ্গতা পায় বৈশ্বিকতা-আন্তর্জাতিকতার সাথে দেশজ আকাঙ্ক্ষার মিলিত রূপে।

ফয়েজ আলমের কবিতার কাছে
রাকিবুল রকি

'বাসমতী ধানের কথাডা আমার কওয়াই হইল না':
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লা ৪ আশ্বিন, ১৩৮৫ তারিখে তসলিমা নাসরিনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, '...কেন বাংলা কবিতায় ত্রিশোত্তর রুগ্ন, পান্ডুর সঙ্গীতহীন ধারার অনুসারি সবাই? যে-বিচ্ছিন্নতার জন্যে তিরিশের কবিরা ক্ষমার অযোগ্য, সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ, সেইব্যক্তিক বিবর-যাপন কেন আজ এই পূর্ববাংলা রক্তিম তরুণদের পথনির্দেশক হবে? পূর্ববাংলার মাটির গন্ধ আলাদা, এ-মাটির মানুষের হাড়ে লবণের ঘ্রাণ– তামাটে চামড়ার এই মানুষ প্রকৃতির সাথে পাঞ্জা ল'ড়ে বেঁচে থাকে। বাংলা কবিতা কি সেই বিশালজনগোষ্ঠির সাথে কোনোই সম্পর্ক রাখবে না?'

প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি বাংলা কবিতার সাথে বিশালজনগোষ্ঠির কোনো সম্পর্ক আছে? বর্তমান বাংলা কবিতা কি বলে মানুষের কথা? নাকি অন্তর্গত স্বনন নির্মাণেই কাটিয়ে দিচ্ছে একটা জীবন? আর বৃত্তাবদ্ধ হয়ে জিহ্বা তৃপ্তির চটাং চটাং শব্দ তুলে ভাবছে, সঙ্গহীন নতুন বাঁক তৈরি করে ফেলেছি?

তবে ব্যত্যয় যে নেই, তা বলছি না। ব্যত্যয়, ব্যতিক্রম সবসময়ই থাকবে। কিন্তু মূলস্রোত কোন দিকে যাচ্ছে? এই মুহূর্তে নচিকেতার একটি গানের কথা মনে পড়ছে। অনেকেই হয়তো শুনেছেন, 'একদিন ঝড় থেমে যাবে' গানটি। গানের মাঝখানে একটি কথা আছে, অনেকেই হয়তো শুনেছেন, অনেকেই হয়তো শোনেননি। কথাটি কী? কথাটি হলো, 'ভাষা আর সেতু নয়, ভাষা আজ অন্তরায়। কাব্যেরা কাঁদে যন্ত্রণায়।' আশা করি, এই লাইনটির কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। যে ভাষা একজন মানুষকে অন্য মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, সেই ভাষাই এখন একজন আরেকজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো। প্রশ্ন হতে পারে, এখানে কোন ভাষার কথা বলা হয়েছে? প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, সমাজের ভাষা, দাপ্তরিক ভাষা নাকি কাব্যের ভাষা? সরল উত্তর, কাব্যের ভাষা। কেননা চাবি লাইন হিসেবে বলাই আছে, 'কাব্যেরা কাঁদে যন্ত্রণায়।' তবে কেউ যদি বলেন, ক্ষমতাসীন সরকারের ভাষাও হতে পারে। তাহলে হয়তো তাকে ভুল বলা যাবে না। যাই হোক মূল প্রসঙ্গে আসি। কবিতার ভাষা দিন দিন মানুষের ভাষা থেকে, কথা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। তাই ফয়েজ আলম যখন বলেন,

> 'আর আপনি কিতাবে সওয়ার পার হয়্যা যান
> এই বাংলাদেশের খাল-বিল-গাঙ, কচুয়া জমিন
> আর কিতাবের দূর দেশে একখান 'বাঙালি' চোতা লটকায়া
> 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো...'
> অথচ আষাইড়্যা চান রাইতের নিশা কিবা
> বাসমতী ধানের কথাডা আমার কওয়াই হইল না।'

(একুশ শতকের দুই বাঙালির আলাপসালাপ)

তখন কিছুটা অবাক না হয়ে পারা যায় না। আবার বলা যায়, অবাক হবার কী আছে, এই তো স্বাভাবিক! আসলেই কি স্বাভাবিক? আমরা তো প্রতিনিয়ত কত কিছুর দাসত্ব করে চলেছি, হাসিমুখে তাবেদারি করছি। আমাদের দেশের সমালোচকেরা, তাত্ত্বিকেরা মার্কেজের 'জাদুবাস্তববাদ' গজফিতেয় মেপে, কেমিস্ট্রি চুলচেরা হিসেব করে আমাদের উপন্যাসকে সেই ছাঁচে ফেলে নাকের ডগায় চশমা রেখে ঘোষণা দেন, না না, এই উপন্যাসে জাদুবাস্তবতা আছে, জাদুবাস্তববাদ নেই। নিক্তির এক দিকে এজরা পাউন্ডের কবিতা রেখে অন্যদিকে দেশীয় কবিতার পোস্টমর্টেম করে বলি, এখানে চিত্র আছে, কল্প নেই। এই কথা শুনে অনুসারীগণ বাহবা বাহবা দেয়। ভাবে, আহা! এমন সমালোচক যদি না আসতো, তাহলে কবে রসাতলে চলে যেত বাংলা সাহিত্য!

যাক, বেহুদা আলাপ রেখে দৃষ্টি ফেরাই ফয়েজ আলমের কবিতার দিকে। কেন? কারণ, কবিতা তাঁর আত্মমুকুর। কবিতাতে তিনি তারই কথা বলতে চান। তিনি চান, ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণাকে ঝেড়ে ফেলে উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাকে এগিয়ে নিতে। সর্বোপরি, কবিতাকে তিনি কবিতা করেই তুলতে চান।

এবার আসুন, ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা বলতে আমরা কী বুঝি, কী বুঝি না– তা নিয়ে দুয়েকটা আলাপ করা যাক। আসলে প্রায় দুইশ বছর বিট্রিশদের অধীনে থাকার ফলে আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতভাবেই বিট্রিশদের অনেক কিছু হজম করে ফেলেছি। এখন ঢেকুর দিলে পেটের ভেতর থেকে যে আঘ্রাণ বেরিয়ে আসে, তা কতটুকু দেশি, কতটুকু বিদেশি তা নির্ণয় করা কঠিন বৈকি! তবে বিট্রিশদের কাছ থেকে যা নিয়েছি, হজম করেছি– তাতে ভালোর চেয়ে খারাপের পরিমাণ যে বেশি, সেই পাঠ তো প্রমথ চৌধুরীই দিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।' কিন্তু কতটুকু ব্যাধি আর কতটুকু স্বাস্থ্য আমরা গ্রহণ করে চলেছি, তা কী জানি? ফয়েজ আলমের ভাষায়,

'সে থাকে আমার সাথেই
আমার বোঝা বা না-বোঝার আড়ালে
আমার জানার মধ্যে সে এক রংচোরা
ঘুরেঘারে, খায়দায়, গোজামিলে ইতিহাস নাটক বানায়।'
(উপনিবেশের দাগ)

বিট্রিশদের তাড়িয়েছি। কিন্তু গ্রহণ করে নিয়েছি বিট্রিশদের সংস্কৃতি। যেমন– টাই। ভাবি, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে হলে, নিজেকে সম্ভ্রান্ত বোঝাতে হলে এই টাই পরিধান ছাড়া কোনো গতি নাই। কবি বলেন,

'এক টাই খুইলা ফালায়া কেন আবার রং মিলায়া বান্ধি
হাসাহাসি করি নিজে নিজে– যেন গলার চাইরদিকে
একখান রশিই প্যাঁচায়া নিজেরে জাহির করি–'
(উপনিবেশের দাগ)

দুইশ বছরে যে দাগ পড়েছে, তা একদিনে মোছা সম্ভব নয়। তবে মোছার চেষ্টা শুরু করতে হবে। নিরন্তর সাধনাতেই একদিন ঠিক ঠিক উৎসমূলে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে। কবি ফয়েজ আলম বলেন,

‘সে টানে পশ্চিমে
আমি বোধের পসারে ইঞ্চি ইঞ্চি পুবেই আগাইতেছি
সে আমার হাতের তালুতে নাকি বোধজুড়ে
বহুজনমের দাগ–
প্রতিদিন তিলতিল মুছতেছি।’
(উপনিবেশের দাগ)

তবে শুধু কি উপনিবেশিক চিন্তা আমাদের আঁকড়ে রাখে? আমরাও কি আমাদের চিন্তার স্বরচিত কারাগারে বন্দি নই? আমরাও কি আমাদের পুরোনো মিথ, অতীত প্রীতিতে আচ্ছন্ন নই? প্রতিদিন কত মানুষ মরে, প্রাণের দাবি জানানোর দোষে বন্দি হয়, কই তাদের জন্যে তো কোথাও কোনো কম্পন নেই, উত্তেজনা নেই, ক্রন্দন নেই। তারা প্রতিনিয়ত ঘটনাস্রোতের সাথেই ভেসে যায়, হারিয়ে যায়। ফয়েজ আলম তার কবিতায় সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের কথা বলেন। বীরের আত্মত্যাগের সাথে পাশের বাড়ির যে আত্মত্যাগী ছেলের নাম কেউ নিল না, কবি তারই কথা বলেন। প্রশ্ন তোলেন আমাদের চিন্তাচেতনায় চেপে বসা জগদ্দলের বিরুদ্ধে।

‘আহা কী মহৎ মউতে ক্ষুদিরামের লাশ
আমাদের কান্ধের সবটা জুইড়া বইসা আছে!
শিশুর লাশ উঠানোর জায়গা আমাদের কান্ধে কি আর আছে!’
(মউত নিয়া গবেষণা)

‘একটা গান আমি গাইতে চাইছিলাম, নিজের গান’:
কবিতার প্রাণ কী– এ নিয়ে বিতর্ক শতাব্দীকাল প্রাচীন। শব্দ, বিষয় পেরিয়ে ব্যঞ্জনাকেই কবিতার প্রাণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন নানা মুনি। তাঁদের মত শিরোধার্য করে নিলে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহাজন জীবনানন্দ দাশের ‘কবিতা অনেক রকম’ মতটিকে মেনে নিতে দ্বিধা থাকে না। তবে শব্দের সাঁকো পেরিয়েই এই ব্যঞ্জনার দরবারে হাজির হতে হয়। শব্দই ঠিক করে দেয় কবির স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব।

ফয়েজ আলমও প্রচলিত কাব্যভাষাকে উপেক্ষা করে প্রমিত শব্দের সাথে আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও সাধু শব্দের সংমিশ্রণে গড়ে তোলেন নিজস্ব বাক্‌রীতি।
দুয়েকটা উদাহরণ দেয়া যাক:

ক.
কানার বাজারে যাইতে যাইতে আমি গাছপালা ফুল পাখি দেখি
আলো আর আন্ধাইরে চোখজোড়ায় শান দেই
যাতে এদের কায়াহীন ছাপ সম্ভাব্য অন্ধত্বরে ঠেকাইতে পারে।
(কানার বাজার)

খ.
আসেন আপনি আমি শরীরে শরীর লাগায়া
বুক ভইর্যা জমায়্যা রাখি দুর্দিনের উম
আর সেইগুলা ফল হয়্যা পাইক্যা উঠার অপেক্ষায় থাকি।
(আপনারে যে-কথা কইতে চাই)

গ.
ছিঁড়াবিড়া পাতা পইড়া থাকতেছে
উড়তেছে, পুড়তেছে না-দেখা আগুনে

গাছ ফিরে গাছের ভিতর।
(পড়ে থাকা পাতা)

আমরা বলছি না, ফয়েজ আলমই সর্বপ্রথম এভাবে কবিতার ভাষা বয়ন করেছে। পূরবর্তী অনেক কবির কবিতাতেই সাধু-চলিত, আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ দেখি। আঞ্চলিক ভাষায় ইতোমধ্যে অনেক বিখ্যাত কাব্যও নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া সাধু-চলিতের মিশ্রণ তো ব্যাকরণই স্বীকার করে নিয়েছে।

তবু বলা যায়, ফয়েজ আলমের শব্দের যে স্বনন– তাতে কিছুটা হলেও ফয়েজ আলমকে চেনা যায়, ধরা যায়। ফয়েজ আলমের মনন গদ্যছন্দের প্রতিই বেশি অনুরুক্ত। তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও তিনি গড়ে তোলেন কবিতাকে। যদিও সেটা অনেক সময়ই গদ্যছন্দের সমধর্মী হয়ে ওঠে।

উপমা এবং চিত্রকল্প নির্মাণেই তাঁর প্রকৃত শক্তি। তাঁর চিত্রকল্প আমাদের নিয়ে যায় নতুন দিগন্তের কাছে। কখনো তা বুদ্ধির চাতুর্যে দীপ্ত, কখনো তা স্মৃতির বারিধারায় সিক্ত। মায়াময়।
কিছু কিছু চিত্র এবং চিত্রকল্প তাঁর কবিতার মধ্য থেকে উদ্ধার করা যাক:

ক.
নাকি মউতের মতো তারা কুয়াশার মধ্যে সান্দায়া
আইজো উড়তেছে অন্য আসমানে।
(আট বছর আগে)

খ.
এই মিসিল কয়েকটা চান আমি বাঁশতলায় ফেলায়া আসছিলাম
দু-একটা গোপনে লুকানো ছিল মাথার ভিতর।
(ঢাকার আসমানে হৈলদা চান)

গ.
নামতেছি
রক্ত মাংস দেহঘড়ি থাইকা
শাদা কাগজ একখান
(দাগ মাত্র)

ঘ.
বাড়ি ফিরার কালে পথ কইমা আসতেছে দেইখা
আমি আগে না-ঘুমানো কোনোও ঘুমের উঁশের পথে ঢুকে পড়ি।
(আমার পায়ে হাঁটা পথগুলি)

ঙ.
আম্মা তাকায়া থাকে দূরের উঁশের দিকে
সইন্ধ্যার নিঃস্বতায় সওয়ার হয়্যা তারা রওয়ানা হইছে'
(আম্মা হাঁটতেছে নির্বাণের দিকে)

কবি কখনো ভূমিহীন হয় না। একটি নির্দিষ্ট সীমানায় বেড়ে উঠেই হয়ে উঠেন সীমাহীন। সকলের। ফয়েজ আলমের কবিতাও কোনে বিচ্ছিন্ন ধারা নয়। বাংলা কবিতার পরম্পরাকে তিনি বহন করে চলেন মনে, মননে, অবয়বে।
তাই যখন পাঠ করি–

'চিনা মানুষের কাছে বিছরাই চিনারে
দেখি পুরানা নামধামের মধ্যে তারা
নয়াভাবে চিনা হইতে চাইতেছে'
(পিছফিরা)

তখন কোথায় যেন বাউলসুরের আভাস পাই। কিংবা কবি যখন বলেন,

'এই যে দেখেন কত রংচঙা দুনিয়া
কে বুঝলো নাই কিবা আছে?
সে ত আমার রুহু আর আমার জবান।
আমি না দেখলেই নাই
ফকফকা সামনে পিছনে।'
(একদিনের সঙ্গী মারফতি ফকিররে)

তখন কি তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে'র কিংবা হাছন রাজার 'আমি হইতে আল্লাহ-রসুল আমি হইতে কূল/ পাগল হাছন রাজা বলে তাতে নাই ভুল'-এর সমধর্মী মনে হয় না?

আসলে কবি হলেন বৃক্ষের মতো, মাটির যেখানে যত মমতা রস পায়, তার সবটুকু টেনে নিয়ে নিজের মতো আনন্দের ফুল ফোটায়।

ফয়েজ আলমের কবিতায় আমরা যেমন আধ্যাত্মিকতার ঘোর দেখি, তেমনি দেখি মানুষের অবদমিত বাসনার চিত্র। ছা-পোষা মধ্যবিত্তের করুণ ছবি পাই। যারা সময় থেকে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অবদমনে ডুবে থাকে, ভাবে হাত পা গুটিয়ে দারুণ এক বিপ্লব করে ফেলবে তারা। ফয়েজ আলমের ভাষায়,

'আমরা সিনেমা দেখতেছি কিছু লাশ পড়তাছে
তাতে তলে পড়তেছে সাবানের বাস
সহবাসের বদলে হাতমারা শেষ।
কাইল সকালে অফিসের কামের ফাঁকে এইখানে
মধ্যবিত্তের একটা বিপ্লবই হইয়া যাবে হয়তো।'
(সিনেমা দেখার আগে)

বলা বাহুল্য, বাংলা কবিতায় মাস্টাবেশনের চিত্র এমন সরাসরিভাবে খুব কমই উঠে এসেছে।

'আমার সকল পথই তো আজ
তোমার মধ্যে এক হয়্যা আছে':

আহসান হাবীব বলেছিলেন, 'আমার একটাই গন্তব্য ছিল, তুমি।' ফয়েজ আলম বলেন,

'তবু পিরিত আর ঘিন্না ভেতর
এই ঘোর লাগা হাওয়া বুকে নিয়া
আমি কোথায় চলেছি?
আমার সকল পথই তো আজ
তোমার মধ্যে এক হয়্যা আছে।'
(কানাওলি জোছনা)

প্রেম কবিতার এক চিরায়ত বিষয়। আবু হাসান শাহরিয়ার যখন লেখেন, 'প্রেমের কবিতাগুলো চিরকালই প্রতিপত্তিশালী।' তখন তা অস্বীকার করা যায় না। কেননা, প্রেম না হলে তো কবিতাই হতো না। সব কবিতাই তো প্রেমের কবিতা। কখনো তা মানব-মানবীর প্রেম। কখনো তা দেশপ্রেম। কখনো বা অন্যকোনো প্রেম। ভালোবাসেন বলেই আবিদ আজাদ বলেন, 'সব পথে যাব, সব পথই গেছে কবিতার দিকে।'

ফয়েজ আলম মানব-মানবীর প্রেম নিয়ে খুব বেশি পঙ্‌ক্তি রচনা করেননি। তবে যে কটি রচনা করেছেন, তাতে তুলেছেন ঘোরের ঢেউ। না পাওয়ার হাহাকার তাঁর কবিতায় আমরা পাই। 'তোমার কাছেই বলা' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

'তোমার কথা ছিল আষাইঢ়্যা মেঘ হয়্যা আসার
খটখটা মাটি আর আসমান একাকার করে।'

কিন্তু সুনীল তো বলে গেছেন, 'কেউ কথা রাখে না।' ফয়েজ আলমের কবিতাতেও দেখি সেই অভিন্ন মন্তব্য। প্রেয়সীকে উদ্দেশ্য করে উপরিউক্ত কবিতার শেষ স্তবকের শেষ তিন লাইনে লেখেন,

'দেখি তুমি স্থির হয়্যা আছ নিদানের শাদা মেঘ-ছায়া।
অথচ তোমার কথা ছিল জলছাপ ভাইঙ্গা
রক্তের জোয়ারে আসার।'

জীবনের নিয়মই এই কেউ কথা রাখুক কিংবা না রাখুক, জীবন বয়ে যাবে আপনগতিতে, নিরন্তর। শূন্যতাগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে। তা যাক। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস তো থাকে। ফয়েজ আলমের কবিতার ভাষাতে বলি,

'ভাবতেছি চাইরোদিকে সবই তো রয়ে যায়–
এই গাছগাছালি, পাক্কা বেঞ্চ, তার গায়ে মরা জোছনা
আরেকটি ট্রেইনের সম্ভাবনা;
তবু ট্রেইন চলে গেলে কেন বিরান বিরান লাগে ইস্টিশানে!'
(ভবের বাজারের ইস্টিশানে)

ফয়েজ আলমের কবিতার বই ‘জলছাপে লেখা’

পারভেজ আলম

ফয়েজ আলমের পরচিতি মূলত বাংলাদেশী উত্তর-উপনিবেশী তাত্ত্বিক ও অনুবাদক হিসাবে। বহু বাংলাদেশী তরুণের উত্তর-উপনিবেশবাদ সম্পর্কিত জানাশোনার ভিত্তিটা তৈরি হয়েছে তার লেখা ও অনুবাদ পাঠ করেই। আমার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তবে ফয়েজ আলমের তাত্ত্বিক লেখালেখির সাথে বাংলাদেশের মানুষ যতটা পরিচিত তার কবিতার সাথে অতটা না। তার প্রথম কবিতার বই ‘ব্যক্তির মৃত্যু ও খাপ খাওয়া মানুষ’ বের হয়েছিলো দুই দশক, আগে ১৯৯৯ সালে, স্মৃতি যদি প্রতারিত না করে থাকে। এই বছর বের হইল নতুন কবিতার বই “জলছাপে লেখা”।

আমার জন্য এইটা বিশেষ ঘটনা বটে। কেননা এই বইয়ের বেশ কিছু কবিতা বিভিন্ন সময়ে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কয়েকটা কবিতা পড়েছিলাম একদম গরম গরম, কবি লিখবার পরপরই। এবং এই কবিতাগুলো লেখা হয়েছে অনেক বছর ধরে। শূন্য দশকে বাংলাদেশী অনেক কবিই উত্তর-উপনিবেশী কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন। তবে ফয়েজ আলমের মত পাক্কা দশক ধরে উত্তর-উপনিবেশী প্রকল্প কবিতার চর্চা আর কেউ করেছেন কি না আমার সন্দেহ আছে। এই কবিতাগুলো তাই কবির বিউপনিবেশায়ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত দীর্ঘ শ্রমের ফলাফল। বইটি যে অবশেষে বের হয়েছে সেটিও বড় একটা ঘটনা।

এই দীর্ঘ পথচলা যে কত কঠিন ছিলো তার ছাপ আছে কবিতাগুলোর মধ্যে। বিশেষ করে সবচাইতে স্বচ্ছভাবে তা ফুটে উঠেছে ’উপনিবেশের দাগ’ নামক কবিতায়। কবি যখন লেখেন:

> সে থাকে আমার সাথেই
> আমার বুঝা বা না বুঝার আড়ালে
> আমার জানার মধ্যে সে এক রংচোরা
> ঘুরেঘারে, খায়দায় গোজামিলে ইতিহাস নাটক বানায়।

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের কর্তাসত্তার বিউপনিবেশায়ন কোন সহজ কাজ নয়। ব্যাপারটা লেখার ভাষার মধ্যে স্রেফ শব্দ, নন্দন আর স্টাইলের মধ্যে দেশি অরিজিনের খোঁজ করা না, তার চেয়ে জটিল ও বেশি কিছু। একজন সচেতন উত্তর-উপনিবেশী তাত্ত্বিক ও কবিও যে উপনিবেশী জ্ঞানকাণ্ডে গড়া উঠা আধুনিক কর্তা-সত্তার বিনির্মাণ করতে গেলে যে নিজেকেই হারিয়ে ফেলার মত পরিস্থিতিতে পড়তে হয় তা ফুটে উঠা এই কবিতার অন্য কিছু বাক্যে:

> আমি আমারে লেখি
> নিজের ছাপ চিন্ রাখি সামাজিক বয়ানে।

মাঝে মাঝে চমকে দেখি আনমনে তাহারেও লেইখা ফেলি
শেষে মুছি যেন জোর করে নিজেরেই মুছতেছি।

বহুজনমের দাগ তির তির করে মোছার এই প্রক্রিয়া সহজ না। তাছাড়া এই দাগ আসলে কয় জনমের সে প্রশ্নও আমাদের মনে চলে আসে। কেবলই উপনিবেশী আমলের? নাকি আরো আগের যে দাগ আমরা বয়ে চলেছি কবি তার কথাও বলছেন? তাছাড়া কেবল উত্তর-উপনিবেশী প্রকল্পের মধ্যে এই কবিতাগুলোকে সংকুচিত করার উপায় নাই।

ফয়েজ আলমের কবিতা যেসব কারণে আমার পছন্দ তার মধ্যে দার্শনিক ও রুহানি দিকগুলাও আছে। 'উপনিবেশের দাগ' কবিতায় আমরা যেমন দেখি তিনি পেছনে উপনিবেশী বড় কর্তার পায়ের আওয়াজ পান, তেমনি 'মউত নিয়া গবেষণা' কবিতায় আমরা দেখি তিনি পেছনে মওতের প্যায়ের আওয়াজও পাচ্ছেন। এই মওত আবার বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের জীবনকে মৃত্যুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া সার্বভৌম ক্ষমতার রূপেও হাজির হয়। এই বইয়ের বিভিন্ন কবিতায় তাই কবির বড় অপর কখনো উপনিবেশী কর্তা, কখনো মওত, কখনো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা, আবার কখনো এখলাস ফকির বা নাম না-জানা মারফতি ফকিরের রূপে খোদ কবির মুর্শিদ। এই মুর্শিদই কবির দার্শনিক ও রুহানি বক্তব্যগুলো নিয়ে সবচেয়ে পরিষ্কার ভাষায় হাজির হন। 'একদিনের সঙ্গী এক মারফতি ফকিররে' কবিতায় ঘোষণা করেন:

এই যে দেখেন কত রংচঙা দুনিয়া
কে বুঝলো নাই কিবা আছে?
সে ত আমার রুহু আর আমার জবান।

আমার দেলের ভিতর আপনার জন্মমৃত্যু হাঁটা চলাফেরা
জাহের আমার মধ্যে, বাতেনও আমার।

ভাবচর্চা আর কবিতা একসাথে করা সহজ নয়। তত্ত্বেও প্রতিফলন কবিতায় ফেলতে গেলে নন্দন অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফয়েজ আলমের কবিতার উপর এই দুর্বলতা আরোপের উপায় নাই। তার কবিতায় নান্দনিকতা আর উত্তর-উপনিবেশী তৎপরতা একদেহ ধারণ করেছে। এমন দাবি করাও ভুল হবে না যে তার নান্দনিকতাই তার উত্তর-উপনিবেশী তৎপরতাকে সফল করেছে।

আগেই বলেছি, সম্পূর্ণরূপে উপনিবেশী প্রভাবহীন কোন কাল্পনিক অরিজিন, ভাষা বা নান্দনিকতা তার কবিতাতে তিনি ধরার চেষ্টা করেন নাই। এ কারণেই তার কবিতা পড়ার সময় কখনো চর্যাপদের পদকর্তাদের, কখনো আমাদের গ্রামবাংলার বাউল ফকিরদের গানের সুর ও রূপকের সাক্ষাত পাওয়া যায়, আবার কখনো বা একজন আধুনিক কবির কবিতা পাঠের অনুভূতি জাগতে পারে। সব মিলিয়ে ফয়েজ আলমের কবিতা একান্তই ফয়েজ আলমের। এর মধ্যে যে হাইব্রিডিটির দেখা আমরা পাই তাই কবির মৌলিকতা, হাইব্রিডিটিই তার শক্তি।

ফয়েজ আলমের কবিতা পাঠের আরেকটা বাস্তব লাভ আছে। এমন অনেক বাংলা শব্দ আছে যেগুলো আধুনিক সাহিত্যে ব্রাত্য ছিলো, এমনকি বর্তমান প্রমিত বাংলাবিরোধী ভাষাচর্চার সময়েও ব্রাত্য রয়ে গেছে। এসব শব্দকে আপনি দেশি শব্দ বা বিদেশী ভাষার বর্গে ফেলতে পারবেন না সহজে। কারণ কবি তেমন কোন বর্গকে তার শব্দের উৎস করেন নাই। কবি বরং উন্মুক্ত থেকেছেন মানুষের প্রাত্যহিক মুখের ভাষার প্রতি। নতুন কোন কাল্পনিক ও আদর্শ ভাষার বদলে একেবারেই মাটির কাছের যে ভাষাকে আমরা ব্রাত্য বানিয়ে রেখেছি একেই তিনি জায়গা করে দিয়েছেন তার কবিতায়। বলা যায় এই কাব্যভাষা তিনি অর্জন করেছেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা চাষ করে। বাংলা শব্দভান্ডারের ব্যাপারে যারা উন্মুক্ত থাকতে চান তাদের জন্য এই বইটি বিশেষভাবে উপকারী হবে।

‘জলছাপে লেখা’ বইটি নি:সন্দেহে ফয়েজ আলমের একে দীর্ঘ সফরের ফসল। আমার বিশ্বাস পাঠকরাও বইয়ের কবিতাগুলো পড়ার সময় এই সফরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবেন। এই সফর নান্দনিক, রাজনৈতিক ও রুহানিয়াতের বিভিন্ন পর্দা অতিক্রমণের সফর। কখনো বা পাঠক নিজেকে আবিস্কার করতে পারেন এমন এক গ্লোবাল ভিলেজের বাজারি হিসাবে যাকে ‘ভব বাজার’ নামে আমাদের গ্রামবাংলার কবিরা বোঝাপড়া ও মোকাবেলার চেষ্টা করছেন। সেই বাজারে ওয়াল্টার বেনিয়ামিন একজন ফ্লানিউরের মত বিপ্লবের কারবারি হিসাবে হাজির হওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। আর ফয়েজ আলম একুশ শতকের বিশ্ববাজারে আমাদের হাজির করেছেন এমন এক সত্তা হিসাবে যার আর কোন নিশ্চিত পাড়ের কথা জানা নাই। মুর্শিদ তার একমাত্র ভরসা। আপাতত তার ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ কবিতার কয়টা চরণ দিয়ে শেষ করি:

> এ হেন ভবের বাজারে মুর্শিদ তুমিই বুঝি একমাত্র ভরসা
> এমন বেঘোর বিশ্ববাজারে ধরা পইড়া
> এখন কোন পাড়ে ভিড়ার বাসনা আমি নিবেদন করি
> তোমার চরণে ?
> আমার তো নিশ্চিন্তা কোন পাড়ের কথাই জানা নাই।

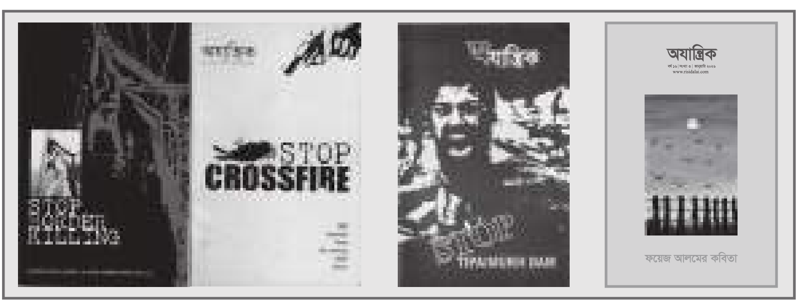

ফয়েজ আলমের কবিতা

ধুলার সিংহাসন

একফোটা উঁশের সমুদ্র পার হইতে দিন চইলা যায়
বনজামের পাতায় বাতাসে গানের আসর
নিরাকের চানপশরে কখন শামিল হব!

তবু আশায় আশায়
কায়া ফেইলা ছায়ারে ধরতেছি মনে মনে
পার হইতে চাইতেছি চামড়া গোশতের দেয়াল।

এখনো নাকে হালখাতার গন্ধ
এক রতি মুথাঘাস
তারেও সেজদা মানতেছি
মোকামের পথ ভাইবা।
তার নিচে ধুলার সিংহাসন।

যেখানে দরদের বোঁটা থাইকা ঝইরা পড়ে
হৈলদা পাতা, মানুষের আফলা বাসনা
বখতিয়ার গাজ্জালী নিউটন।

ঘর

তুমি যেন একটা ঘর
অবেলায় শূন্যে বানতাছি
যোহর বেলার গান এই খানে কিছুটা বিদেশী
আর না গাই সেইসব গান, বরং দুনিয়ার মায়াবী বুনিত
না-ফোটা বাসনাগুলি রাইখা বলি
তোমরা জন্মাইও কতক সবুজ ঘাস
অন্য কোন সময়ের উরে।

আমি তো বাওরা ঘরামি আইজ
ঘর ভাইবা এক মনে তোমারেই বান্ধি
তলে তলে কার কোন তিরাসের টানে
এইখানে যেইসব দৃশ্যের ছুরা জন্মাইতেছে
বিকালের দেওলিয়া রৈদে তুমি তার ঝড়

আমি হৈলদা পাতা হয়া ঝরি!

সিনেমা দেখার আগে

সিনেমা দেখার আগে আমরা স্ক্রিপ্ট দেখি
পথে শাহবাগের মোড়ে একটু বসি চায়ের দোকানে
উঠতি বয়সের ছেলে ও মেয়েরা কে কারে চোখ মারতেছে
আমরা মজা পাই
মৌসুমের আগেই আমরার ছেলেমেয়েরা সাবালক হইতেছে!

চাঅলারে কই 'মামা' তাতে কিছুটা সাম্যবাদ হইল
পায়ে পড়ে না তার মাথার ঘাম
শার্ট ভিজতেছে বলে ভাবা যায়
আহা এই শট কি দারুণ--
যত দূর যাইতে পারি মধ্যবিত্তের শিল্প কলা
ততদূর দাড়ায়া কই, ঠিক পথের প্যাঁচালের মত, দারুন দারুন!
নিদারুণ হইলো না কি!
রিক্সাঅলারে জিগান যাইতে পারে নিদারুণ তার জীবন
প্যাডেলের পাশ দিয়া অতঅত দামি গাড়ি
আসমান ছোঁয়া বিল্ডিংগুলার নিচ দিয়া
স্ক্রিপ্ট দেখা চলতেছে

মধুমালা নার্গিস সাবানের বাঁসে আমরা শেষে
উত্তেজিতই হয়া পড়তাছি মনে হয়
কাজেই এই সময় গুলির শব্দ মোড়ে মোড়ে,
বেশ যায়, যাইতেই পারে
সিনেমার শেষের দিকে কিছু কিছু মারামারি
কিছু গলাবাজি
যদিও এইখানে স্ক্রিপ্টের ভিতর কেমন সুনসান বোবা মানুষেরা।

আমরা সিনেমা দেখতেছি কিছু লাশ পড়তাছে
তাতে তলে পড়তেছে সাবানের বাঁস
সহবাসের বদলে হাতমারা শেষ।
কাইল সকালে অফিসের কামের ফাঁকে এইখানে
মধ্যবিত্তের একটা বিপ্লবই হইয়া যাবে হয়তো।

পথের লেখা. এক

আমি তো পথের ঘোরে
কতদূর হাঁটি
ভাবি এই পথ মোকামের দিকে
তবু মোকামে না ফিইরা কেন পথেই ঘুরতেছি।

গন্তব্যের আগেই কারো নাদেখা পায়ের দাগে
আরেক পৃথিবীর পর্দা উঠতেছে কোনোখানে
আমি আর তার পথুয়া না, আড়ালের দর্শক মাত্র
লেখা হইতেছি কোনো ঝরা বটপাতার গায়
বিকালের মনমরা রৈদ।

পথ যাইতেছে পথ বদলায়া
আমার না-দেখা কোনো দূরে
মিলতেছে অন্যকোনো পথের নিশানা
এইখানে থাকতেছে তার একমাথার ইতিহাস
পথে পথে গড়ানির হুহু গান!

অচল পুরানা পথে
পায়ে পায়ে নিরালায় আঁকতেছি পাতাপড়া সুর।

মন খারাপের আগে

মন খারাপের আগে
নিজেরই ভিতরে কিছু বাড়তেছি গুনগুন গান
দূরের অনচিনা সুর।
আমার মুখরা সময়রে কেউ তাড়ায়া নিয়া গেছে
এইখানে জমতেছে না-আসা সামনের কতক
বোবা কালা দিন,
আমারে ছাড়ায়া তাতে নামি দোনামোনা
যেসব মুখের কাছে ছড়ায়া ছিটায়া বাঁচা
বিছরায়া দেখি তারা সরতেছে কেবল
যেন বস্তু থাইকা দৃশ্য সরতেছে তফাতে
মুছতেছে বস্তুর সীমানা

মন খারাপের পরে
আমি যেই দৃশ্যের শরিক
সেইখানে সময় যেন বা এক দুঃখের গান
চাইরদিকে

আমি সেই জনসমুদ্রে
একফোঁটা নামছাড়া অচিন বেদনা
নিজমনে ফুইটা আছি ধুতরার ফুল!

আমার মেয়েরা যখন কীবোর্ড বাজায়

আমার মেয়েরা কীবোর্ড বাজানোর সময় ভাবি
কী বোর্ডের একটা আত্মা আছে
অনচিনা পাখি সাইজা দিনরাইত বনে বাদাড়ে ঘুরে
কেউ বাজাইতে গেলে উইড়া আইসা বসে মেশিনের মনে,
মানুষের কত শত বছরের না-কান্দা দুঃখুগুলারে
তখন সে একলাই কান্দে আঙ্গুলের নিচে।

বাজানো শেষ হইলে আমি আফসোসের কাছে বসি,
জীবনে কীবোর্ড বাজানো শিখলাম না কেন, আহা!
ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে আঙ্গুল নাড়ায়া-চাড়ায়া ভাব ধরি
যদি ভুলে আমারে বাজনদার ভাইবা
তার আত্মা আইসা জায়গা লয় ফের

আমার আঙ্গুলের নিচে
তাইলে আমিও তার সাথে সেইসব গোপন কান্না
কিছু কানতে পারতাম
মাঝে মাঝে উড়তে পারতাম গাছে ডালে এতিমের উড়াউড়ি।

দেখি ভিতরে হারানোর মত গভীর উঁশ
তবু আঙ্গুলে উঠে না
কি এক সুর জানি ইশারা দিয়াই
বেবান হাওড়ে মিলায়।

তবু আমি আমার ভিতরে বদলাইতে থাকি
তার গায়েবি আত্মার কাছে সিজদা দিয়া বলি
ওগো আত্মা কীবোর্ডের
তুমি একবার আইসা কাঁন্দ
আমার আঙ্গুলের নিচে।

আমার নফসের যত দুঃখু
রুহুর সকল বেদনা তোমার ঠোঁটে লও
আমার গলায়া তুমি নামাও জীবনের যত যত উঁশ
জাহেরি বাতেনি,
দূর কোনো অজানা সইন্ধার আগের
শেষ আলোর মত
আমারে উড়াও ধুলা গায়েবের দিকে।

উপনিবেশের কায়াবদল

কালা পিঠে সাদা হাতের চাবুক পড়ে
কুস্বপ্নের রক্তজরুল
সুতানটি-পলাশির ঘোরে
ঘুরপাক আমাদের বাসনার যত গান
আমার মায়ের সব সোনাদান
কালা মাথায় জাহাজে উঠতেছে।

তবু বাঁইচা থাকি
কালের হরফ বদলায়া খোদাই
এই কেবলই বাঁচনের নাম।
আচানক গোলামির ব্যকরণ লেখা হয়

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে
ইতিহাসে আমরা বাঁইচা আছি যুগ যুগ।

কোন্‌দিন সাদা হাত কালা হয়
আমরা জানি না
কালা হাতের জোর বাড়ে
চাবুকের বদলে সে ছুঁড়ে বুলেট
কালা পিঠে
আমার মায়ের সোনাভরা জাহাজ পাচার
কখনো থামে না।

কানাওলি জোছনার নিশানা

তুমি বুঝি কানাওলি জোছনার নিশানা!
যেদিকেই পাও মেলি
তোমার দেওড়িতে গিয়ে ঠেকে মুখ।
ছায়া পইড়া থাকে পথে পথে।

সুর থেকে শব্দ শুষে নিয়ে
তোমার নিঃশব্দ্যে আমার সকল গান আজ নিরাকের হাহাকার।
রক্তের প্রত্যেক বিন্দুতে কেবল তোমার
স্বেদ কিবা বিষ পড়ে আছে।

যে-তিরাস পথে পথে ঝরে
আমি জানি তোমার তালুতে তার নিবারণ নাই।

তবু পীরিত আর ঘেন্নার ভেতর
এই ঘোর লাগা হাওয়া বুকে নিয়া
আমি কোথায় চলেছি?
আমার সকল পথই তো আজ
তোমার মধ্যে এক হয়্যা আছে।

একুশ শতকের দুই বাঙালির আলাপসালাপ

ধরেন যে, দুর্বায় চিত হইয়া শুইয়া আমি যখন দেখি নীল আসমান
আপনি কইলেন 'দিকদিগন্তে শুভ্রনীলাকাশ'।
এই কথায় আমার আসমানে কালিঝুলি, রৈদ মনমরা
আর আপনে বিদ্যুতের খুঁটিত শুভ্রনীলাকাশ লটকায়া
ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ... কুড়ির শতক পার হয়্যা যান আজব বাজারের পথে
জঙলি ফুলের বাঁসে মাতাল বাংলা কথাডা কিন্তু আমার শুরুই হইল না।

আমার পায়ের নিচে মাটির উম, কার্তিকের বাঁস,
আপনি কইলেন 'পদতলে মৃত্তিকার ওম্, শস্যের ঘ্রাণ'
যেই কথা আমার না, যেই কথায় বাঁস মায়া কিচ্ছু নাই
সেইসব কিতাবী কথা আমি শুনি আপনার জবানে।
শুনতে শুনতে আমি বিলপাড়, কাইমের রঙিন পাঁখ হারায়া ফেলি
ধানক্ষেত জঙলিফুল, রাখ্খোয়ালের আনমনা বিচ্ছেদী গান-
আহা এই বাংলাদেশ-আমি বেবাকই হারাই।

আর আপনি কিতাবে সওয়ার পার হয়্যা যান
এই বাংলাদেশের খাল-বিল-গাঙ, কচুয়া জমিন
আর কিতাবের দূর দেশে একখান 'বাঙালি' চোতা লটকায়া
'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো...'
অথচ আষাইঢ়্যা চান রাইতের নিশা কিবা
বাঁসমতি ধানের কথাডা আমার কওয়াই হইল না।

পুরানা কাটার দাগ

তোমারে ভুইলা গেছি
অথবা ভুলি নাই

মাঝখানে কয়েকশ বছর যেন পার হয়া গেছে
ভুলেভালে
আমাদের, না কি একলা আমার!

এরমধ্যে তোমারে তো ভুইলাই গেছি--
হাত কিংবা পায়ের শুকনা কাটা দাগের মতন
বেদনাবিহীন!
সারাদিন মাঝে মইধ্যে চোখ যায়, মনে পড়ে
সারাদিন মাঝে মইধ্যে ভুইলা যাই।

গণঅভ্যুত্থানের পরে

গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা
ফুলার রোডের নিরালা ফুটপাতে বসি
শহীদ মিনারের সিড়ি পার্কের বেঞ্চিতে বইসাই থাকি,
যেন কিছু একটা ঘটবে।

এইখানে আপাতত গুমঘর গুলিবৃষ্টি কাঁদানে গ্যাস নাই
চাপাতি হকিস্টিক বুটের আওয়াজ নাই।
তাই আমাদের গানগুলি যত্নে পকেটে রাখতেছি,
রাষ্ট্রমঞ্চে ভিনদেশি পুরাণের আখ্যান
আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেষ হইলে পরে
মনদিল ঢাইলা দিয়া দুএকটা গাইতে চাই
জনতার আসরে।

আমরা টুকটাক চিনা বাদাম খাই, মামার লাল চা খাই
ভাবি দুনিয়া বদলায়া গেছে, পুরানা দিন শেষ।

চাইরদিকে চিনা দৃশ্যগুলা আবার আঁকা হইতেছে চুপে
গলির কুকুর ফিরত, চাঅলা বসছে আগের ভাঙ্গা বেঞ্চিতে
কোনোখানে শানানো ক্ষুরের ফলায় রৈদ--
আমরা দেইখাও দেখি না।

ছোটবেলা আমাদের সব কথা শেষ হওয়ার পর
দাদীর কিস্‌সার কথা শুরু হইত
যেখানে রাক্ষসের মউতের পর
নিশ্চিত সুদিন আসবেই।
এইখানে দিন মাস
কেবল লম্বা হয় অজানা পথ থাইকা পথে,
তার জায়গায় জায়গায় ঝইরা গেছে
আমাদের সোনার ছেলেরা।

তখন কার্তিকের মনখারাপ আলোয়
জারুলের সবুজ পাতায় লালরঙা ছোপ দেইখা মনে পড়ে
দুনিয়াতে মাঝে মধ্যে গণঅভ্যুত্থান হয়
এবং প্রত্যেক গণঅভ্যুত্থানের পর
মানুষ আর মানুষের আশা একলগে
পার্কে শহীদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটপাতে বসে,
বইসাই থাকে---না-হাঁটা পথের দিকে

যেন কারো, কোনো কিছু ঘটবার অপেক্ষায়।

এইরকম বুকফাটা নিরবতার মধ্যে
অনন্ত অপেক্ষারও একটা অর্থ থাকার কথা,
আমরা হয়ত সেইটা পড়তে পারতেছি না!

কানার বাজার

কানার বাজারে যাইতে যাইতে আমি গাছপালা ফুল পাখি দেখি,
আলো আর আন্ধাইরে চোখজোড়ায় শান দেই,
যাতে এদের কায়াহীন ছাপ সম্ভাব্য অন্ধত্বরে ঠেকাইতে পারে।

আমার জিজ্ঞাসার সীমা নাই-কানার বাজারে কি সকলেই কানা?
সেইসব কানারা কী কেনাবেচা করে?
কানার বাজারে তারা আসা যাওয়া করে কোন বাতেনী চোখে,
কোন অন্‌চিন্‌ বাসনায়?

দেখি তারা অলিগলি করে, ভিতর-বাহির যায়;
আমারে দেখে না, নাকি, দেখার মত পার হয়্যা যায়,
আমি কিছুই দেখি না।

যেন বা কানারা কোন কানা নয়-
হয়তো তারা সকলই দেখে আমার না-দেখার মইধ্যে
আর আমি চোখঅলা তাদের দেখাদেখির কিছুই দেখি না।
এ কেমন বাজার যেখানে কানা ছাড়া আর সকলেই আন্ধা!
আমি শেষে কানা হই দেখার উদেশ্যে,
চোখজোড়া খুইলা আন্ধা হই।
অচল দৃষ্টিরে যত্নে রাখি জেবের ভিতর।
তবু আমার কোন বাতেনী চোখ গজায় না বলে
ডাইনে-বাঁয়ে হাত নাড়াই অন্ধের মিসিল।

যেন বা একটাই বাজার তাতে দুই কিসিমের কানা মানুষ-
আন্ধা তাহারা আমার অ-দেখার ভিতর এই জগতেরে দেখে, চলেফিরে।
আমি স্বেচ্ছা আন্ধা তারারে হাতড়ায়্যাই ফিরতাছি।

চোখের দুঃখুগুলি : দুই

আমরা উইঠা চইলা যাই
আমাদের চোখগুলো তাকায়েই থাকে পরস্পর
টেবিলের দুই ধার হতে।

যে কারণে মনশ্চক্ষে চলাচল করি
আর সব পথে বের লাগায়্যা
সবজিখেত ঘরবাড়ির দিকে যাইতে যাইতে আমি
কদমতলা জারুল জঙ্গলে চইলা যাই।
জারুল পাতারে সেলাম করে কই
সোনা রৈদ কি কথা আঁকতেছিল তোমাদের বুকে পিঠে
সেই জ্ঞান দিও এই আধা-অন্ধ অভাগারে।
আর মনশ্চক্ষে দেখি তোমার ঘরে ফিরা।

এই ঘর, তোমার এত প্রিয় অঙ্ক খাতা!
হিসাব মিলে নাই তাই
চোখগুলি ফিরায়্যা নিয়্যা গেছি যে যার।

চোখের মেমোরিতে জমা হইছিল কিছু, কয়েক বছর,
আমাদের সেই মায়াবী সময়ের অপরূপ-
মাইঝরাতে আমাদের চোখ তাকায়া তাকায়া তাই দেখে।
আমরা আর ঘুমাতে পারি না।

আমার ভাই আফজাল মারা যাওয়ার পর

মওতা বাড়িতে গেলে আমরা দুইভাই
তাড়াতাড়ি ফিইরা আসতাম একসাথে
মওতের ঠান্ডার থাইকা যেন বা উমের কাছে
বাড়ির দিকে ফিরা।

যেইবার সে মারা গেল
তখন আমার আর ফিরার কোনো বাড়ি নাই
সারা দুনিয়াই মওতা বাড়ি!
আমরা মওতা বাড়িতে বইসা থাকি
মওতারে গোসল দেই
কাপড়চোপড় পরাই
তার সাথে দুই একটা কথার উসিলায়

মনে মনে একলাই কান্দি
তারে কবরে শোয়ায়া!

তারপরে গোরস্থানের সইন্ধা পার হয়া
মওতের কাছের একলা রোদনগুলা পার হয়া
দুই ভাই আবার বাড়িত ফিরতে থাকি--
এই মত কথা কই
দুইজনে আবার
আমি ও আমার ছোটোভাই ।

একটাই কায়া
তবু
তার মধ্যে দুইজনে সওয়াল-জওয়াব করি,
একটা কায়ার ভিতরে আইসা একসাথে হয়
আমাদের ছোটো ও বড়বেলাগুলি।

সে একটা বাচ্চার আঙ্গুলে আমার হাত ধইরা হাঁটে
একবার কে জানি বলে, এই, তুমি ছেলে না মেয়ে'
সে ভাবে, সে, 'ছেলেও না মেয়েও না, একটা বাচ্চা'
আমি বড়বেলা হয়া তারে বুঝাই--
এই জগতে ছেলে মেয়ে বাচ্চা বড় বলে কিছু নাই,
সকলই রুহু মাত্র।

আমরা হাঁটতে থাকি
ছোটো-বড়, ছেলে-মেয়ে, মওতা-জিন্দাগুলা পার হই
দেখা না দেখার কিংবা নফসের আড়ালগুলা পার হয়া
আরও দূর বহুদূরে হাঁটতে হাঁটতে
যেখানে পৌঁছাই সেইখানে আমরা দুইজনে যেন
একই কায়ায় দুই রুহু
নিঃশব্দের জঙলায়।

আমি তার মার্বেলগুলিরে খেলি, পুরানা কবিতার খাতায়
তার দুঃখু ও কান্দনগুলি চিনতে যাই
সে সামনে দাড়ায়া জিন্দা হাসি হাসে
আমার মতন।
দুইজনে কথা বিছরায়া আনি
পিছেরও পিছের রাইতের বারান্দা কিংবা
হিঁজলতলার সইন্ধার আগের বোবা কথাগুলি

নিঃশব্দেই বলাবলি করি।
তখন সে আর কোনো মওতা না

আমারই কলবে শামিল
প্রতিদিন হাজির থাকতেছে সেও
আমাদের হাসাহাসি, মওত ও অমওতের মাঝখানের
নীরব আলাপে।
তার জন্য আমার গোপন কান্দনগুলায়
প্রতিবার সেও কিছু কানতেছে।

সিলেট থাইকা ফিরার সময়

সিলেট থাইকা ফিরার সময়
আমরা প্রথমে সিলেট পার হই
জানালার বাইরে তখন আশ্বিনের রৈদ
ভিতরে মরা পাতারা উড়তেছে
চৈতের আসরে।

এইরকম ঘোর বেমিলে
সেইটা ছিল একটা কঠিন কাজ।
শেষে একটা অনচিনা বাজার পার হওয়ার পরে
মনে পড়ে আমরা একটা লম্বা সফরে আছি!

বহু গ্রাম বাজার বটতলা
দেখা ও না দেখা দৃশ্যের কাতার
পার হয়াই যাইতে হবে
মানুষের মুখ
তার হাসি
গোপন ও জাহির কত ভালোবাসাবাসি
আমরা কেবলই পার হয়া যাব।

মিরপুর বাজারের কাছে আমাদের মন
বেশ হালকা হালকা লাগে
আসরের মরা রৈদের ভিতরেও ফুরফুরা
চা খাই বিস্কুট খাই
সিগারেটের সাথে ভুলেভালে কয়ঢোক দুক্‌খুও খায়া ফেলি।
মৌলভী বাজার পার হয়া সন্ধ্যার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে

মনে পড়ে আমরা তো লম্বা সফরে!
চোখের পলকে সিলেট পার হয়া আসছি।

আর, এখন সইন্ধ্যার ধুয়াগুলা পার হওয়ার সময়
আমাদের দূরের উঁশের কথা মনে পড়ে
আরও আরও সইন্ধ্যার কিনারায় দুঃখের ভার
আমাদের যত চলাচল
মনে পড়ে।

এই ঘোরে
গন্তব্য বুঝার আগেই আমরা আমাদেরও পার হয়া যাই
লম্বা সফরে অনচিনা বেদনার উঁশ
সন্ধ্যা পার হয়া ঝইরা পড়তে থাকি
রাইতের উরের ভিতর।

সিলেট থাইকা ফিরার সময়!

দূরের দৃশ্যের দিকে

কিছু কথা হুঁশের আড়ালে পড়তেছে
কলবে গায়েব থাকতেছে কোনো কোনো কথা
অন্য কোনো দিনের আশায়

পাখি উড়ার কালে
বলতে কি চাইছিলাম এইসব সাদাকালো কথা দিন রাইত!

পুরানা দেখার ভিতর কিছু মুখ আলাজালা হয়
নিজের ছায়ার কাছে আইজো তেমনি নত হয়
একলা জারুল;
বিপুল উঁশের ঘোরে উইড়া গেছে কত সুর
গাওয়া তো হইলো না একটাও!

এইসব দৃশ্যের শামিল হইতে গিয়া
বেভুল বিদেশি পথে
কেন যে হইছি একটা ভাঙ্গাচোরা ছায়া!

আমার হরফেরা

কয়টা অক্ষররে আমি সাজাইতে যাই
একটা আলাভোলা কদমের ঠান্ডা সুরতে
কিংবা ইস্কুলবেলার ফজরের পর দূরের আসমান
তার উড়ু উড়ু টানে সুখ,
কিছু শব্দরে মওকায় পায়া
তাদের শরীরে আঁকতে যাই একটা মন-ভালো দুপুর।

দেখি হরফেরা জায়গা বদলায়া বসে
নিজে নিজে লেখা হইতে চায় আর কোনো দিনরাইত
সাজানো ঘরের ভিতর যতই বসাই
তারা ঠিক নিজের নিজের জায়গায় ফিইরা যায়
আনমনে আঁকা হয় একলা একটা হৈলদা মরা পাতা
না হইলে শুকনা মুথাঘাস কিছু
বুকে যার পুরান সবুজকথা

আমি শব্দদের বলি, তোমরা তো আমারই সুর
অথবা আমিই তোমাদের কায়া হয়া এতকাল
দুনিয়ার সকল বেদনার কিস্‌সা গায়া গেছি
আমার ভিতর থাইকা আর কেন তুইলা আনো সাদাকালা দিন,
আমারে উড়াও কেন অনচিনা বাউনির ভিতর
এক কনা ধুলা!

তোমরা কোনো দুঃখ হয়ো না
আর না হইতে চাই নিরলে বেদনার গীত
আমারে প্রকাশ কর একটা সরল হাসির আদলে
কিবা ছোটো বেলার কোনো ভুলে-ভরা গান।

ফয়েজ আলম এর জন্ম ১৯৬৮ সালে নেত্রকোনা জেলার আটপাড়ার যোগীরনগুয়া গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (সম্মান) ও এমএ পাশ করার পর প্রাচীন বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার জন্য এমফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজঃ ব্যক্তির মৃত্যু ও খাপ-খাওয়া মানুষ (কবিতা, ১৯৯৯); এডওয়ার্ড সাইদের অরিয়েন্টালিজম (অনুবাদ, ২০০৫); উত্তর-উপনিবেশি মন (প্রবন্ধ, ২০০৬); কাভারিং ইসলাম (অনুবাদ, ২০০৬), ভাষা, ক্ষমতা ও আমাদের লড়াই প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ, ২০০৮); বুদ্ধিজীবী, তার দায় ও বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব (প্রবন্ধ, ২০১২), জলছাপে লেখা (কবিতা, ২০২১); ভাষার উপনিবেশঃ বাংলা ভাষার রূপান্তরের ইতিহাস (প্রবন্ধ, ২০২২), রাইতের আগে একটা গান (কবিতা, ২০২২), আমারে উড়াও ধুলা (২০২৪), বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা (২০২৪); যখন রুহুরে হারায়া ফেলি (কবিতা, ২০২৫)।

রিসি দলাই-এর বই

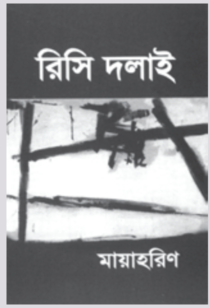

কবিতার বই

মায়াহরিণ

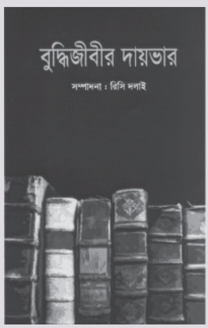

সম্পাদনা

বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসার দলিল

বুদ্ধিজীবীর দায়ভার

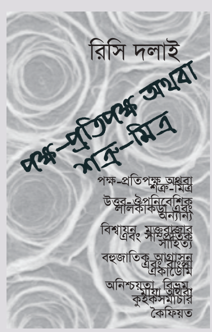

প্রবন্ধ

লিটলম্যাগ ও প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা নিয়ে
বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ সংকলন

পক্ষ-প্রতিপক্ষ অথবা শত্রু-মিত্র

এখন জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম

আরো সহজ শর্তে ও বেশি মুনাফায়

মাসিক কিস্তির পরিমান	মেয়াদ পূর্তিতে এককালীন প্রদেয়	
	৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী	১০ (দশ) বছর মেয়াদী
৫০০	৩৮,৬১৪	১,০০,৮০৪
১,০০০	৭৭,২২৯	২,০১,৬০৮
২,০০০	১,৫৪,৪৫৯	৪,০৩,২১৬
৫,০০০	৩,৮৬,১৪৭	১০,০৮,০৪২
১০,০০০	৭,৭২,২৯৫	২০,১৬,০৮৪
১৫,০০০	১১,৫৮,৪৪২	৩০,২৪,১২৬
২০,০০০	১৫,৪৪,৫৯০	৪০,৩২,১৬৮
২৫,০০০	১৯,৩০,৭৩৭	৫০,৪০,২১০

এই হিসাবের সুবিধাসমূহ

- মাসের যেকোনো তারিখে হিসাব খোলা এবং কিস্তি জমা দেয়া যায়।
- মুনাফার হার ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে।
- অনলাইন এবং eJanata এ্যাপ্‌সের মাধ্যমে কোন চার্জ ছাড়া টাকা জমা দেয়া যায়।
- হিসাবধারী মারা গেলে নমিনী হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।
- আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাদে অন্য কোনো সার্ভিস চার্জ নেই।
- হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা আছে।
- পিতা/মাতার পরিচালনায় নাবালকের নামে হিসাব খোলা যায়।

এই স্কীমটি খুলতে আপনার নিকটস্থ জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় আজই যোগাযোগ করুন

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.jb.com.bd

আমাদের প্রকাশনা

চারবাক

বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর